ডানাকাটা পরী

যুথিকা বড়ুয়া

(এক)

ঘুম ভাঙ্গতেই মেজাজটা গেল খাট্টা হয়ে। গুমোট মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। আলো নেই, বাতাস নেই। পশু-পাখীর কলোরব নেই। চারদিক নীরব, নিস্তব্ধ। গাছের একটা পাতা পর্যন্তও নড়ছে না। আজও সূর্য্যকিরণের দর্শণ পাওয়া যাবে না মনে হচ্ছে! দিনের বেলাই নেমে এসেছে অন্ধকার। এক্ষুণি ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি নামবে। সেই যে পড়শু সন্ধ্যায় ঝড় তুফান মাথায় নিয়ে কোলকাতায় পৌঁছে চার-দেওয়ালের ভিতর বন্দি হলাম, আর বের হবারই জো নেই। শুরু হয়েছে মুসলধারে বৃষ্টি। যেন আকাশ ভাঙ্গা বৃষ্টি। থামার লক্ষণই নেই। তন্মধ্যে লোডশেডিং, ভাপসা গরম, স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধ। দম বন্ধ হওয়ার যোগার। - 'ধ্যুত্তোরি!'

অস্বস্তিতে দিন যায়, রাত পোহায়। ভাবলাম, এবার প্ল্যান-প্রোগ্রাম সব গেল বোধহয় মাটি হয়ে। শুনেছি, কোলকাতা মহানগরীতে পাতালরেল চালু হয়েছে। গোটা শহর জুড়ে ওভার ব্রীজ তৈরী হয়েছে। সল্টলেকে সাইন্স-সেন্টার ওপেন করেছে। গঙ্গানদীর উপর 'বিদ্যাসাগর' নামক বিশাল সেতুও নির্মিত হয়েছে। কিছুই আর দেখা যাবে না।

কিন্তু না, অচীরেই সে ভাবনা গেল দূর হয়ে। টানা ছত্রিশঘন্টা প্রবল বর্ষণের পর দেখা গেল, জানালা দিয়ে আগত পূর্বদিগন্তের প্রভাতরবির উজ্জ্বল রক্তিমাভায় আবিরলালে ছেয়ে গিয়েছে সারাঘর। বেশ মনোরম আবহাওয়াই বটে! স্বচ্ছ রৌদ্রাজ্জ্বল সুনীল আকাশ। বইছে ঝুরুঝুরু মিহিন বাতাস। সুপবন আমোদিত হয়ে আছে, বাগিচার লাল-নীল-হলদে-বেগুনী ফুলের মধুর সুরভীতে। শিহরণে অনুভূত হয়, বসন্তের মৃদু ছোঁয়া। তখন আর ধরে রাখে কে! প্রকৃতির প্রাণবন্ত উচ্ছাসের টানেই মানসিক অবষাদ ঝোরে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে হৃদয়-মন-প্রাণ আমার রাঙা হয়ে ওঠে। তক্ষুণিই স্বতঃস্ফূর্ত মনে বেরিয়ে পড়ি। পাতালরেলে চড়ে এলাম জনবহুল এ্যাস্প্ল্যানেডে। সেখান থেকে ভিক্টোরিয়া মনুমেন্ট, ফোর্ট-উইলিয়াম, গড়ের মাঠ, বাবুঘাট হয়ে গিয়ে পৌঁছাই হাওড়া রেলষ্টেশনে। যাবো ফুলেশ্বরী, ছোট পিসিমার বাড়ি। ট্রেন ধরবো বলে সবেমাত্র প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, তক্ষুণি পিছন থেকে এক ভদ্রমহিলা আমার বেনী ধরে টান দিয়ে বলে,-'কিরে, চিনতে পারছিস? বল্তো কে?'

হঠাৎ থতমত খেয়ে গেলেও খানিকটা বিব্রোতবোধ করি। এতবড় রেলষ্টেশন, অনবরত একটার পর একটা যাত্রীবাহী ট্রেন এসে ঢুকছে ষ্টেশনে। তন্মধ্যে ক্রমাগত বিশাল জনসমুদ্রের ঢেউ উপছে পড়ছে গায়ের ওপর। কিছু বলা তো দূর, ভীড়ের মধ্যে সুস্থির ভাবে দাঁড়াতেই পাচ্ছি না। এদিকে মহিলাটিকে চেনা বলেও মনে হচ্ছে না। পড়ে গেলাম বিস্ময়ের ঘোরে। কে এই ভদ্রমহিলা? কোলকাতা শহরের এতবড় রেলষ্টেশনে হঠাৎ দর্শণে এমন অন্তরঙ্গভাবে আলাপচারিতায় উৎফুল্ল হয়ে উঠার মতো কে হতে পারে!
বিস্মিত নয়নে মহিলাটির আপাদমস্তক লক্ষ্য করলাম, জরা-জীর্ণের মতো রুক্ষসূক্ষ চেহারা। কেশ-বিন্যাশ এলোমেলো। পড়নের কাপড়ের অবস্থাও তদ্রুপ, দামী হলেও মলিনতার ছাপ প্রকট। শরীরে কোনরকমে জড়ানো। সধবা না বিধবা তাও সঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটে উঠলেও চোখদু'টো বিষন্নতায় ভরা।

হঠাৎ দৃষ্টি বিনিময় হতেই ভদ্রমহিলা ফিক্ করে হেসে ফেলল। ইতিমধ্যে খড়গপুর লোকাল ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই শুরু হয় যাত্রীর হুড়োহুড়ি, ঠেলাঠেলি। একেবারে গায়ের উপরেই হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। এমতবস্থায় হঠাৎ ছিটকে গেলাম দুজনে। সন্ধানি দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলাম, ভদ্রমহিলা কোথাও নজরে পড়ল না। আমি উপেক্ষা করে উঠে পড়লাম ট্রেনে। আর তৎক্ষণাৎ রেলওয়ের এ্যাঙ্কোয়ারী অফিস থেকে ঘোষিত হল,-'যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ট্রেন ছাড়তে দেরী হবে।'

কি করি! খানিকটা বিব্রোতবোধ করলেও মনটা বিষাদে ভরে গেল। কিন্তু কিছুতেই ভেবে কূল পাচ্ছিলাম না যে, ফেরেস্তার মতো দর্শণ দিয়ে ভদ্রমহিলা গেল কোথায়? কমপার্টমেন্টেও দেখছি না। কিন্তু হঠাৎ মনে হলো, ভদ্রমহিলার নিশ্চয়ই কোনো গ্যাং-ট্যাং আছে। সেরকম উদ্দেশ্য নিয়েই ও' এসেছিল, সুবিধে করতে না পেরে কেটে পড়েছে।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ চমকে উঠি। চোখ তুলে দেখি, উল্লেখিত মহিলা ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে হাঁপাচ্ছে আর বলছে,-'কি রে, শুনলি তো, ট্রেন ছাড়তে দেরী আছে, চল্ বাইরে গিয়ে বসি!' বলে খপ্ করে আমার হাতটা ধরে একরকম টানতে টানতেই প্ল্যাটফর্মের একটা বেঞ্চিতে নিয়ে গিয়ে বসালো। চোখমুখ বিকৃতি করে বলল,-'ইস্, ঐ ভীঁড়ের মধ্যে এতক্ষণ বসে ছিলিস কি করে তুই? বিছছিরি! লোকের গায়ের দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসছিল! রাবিশ!'

মনে মনে অস্বস্তিবোধ করলেও কেমন সন্দেহজনক মনে হ'ল। মহিলার উদ্দেশ্যটা কি? মোটেই পিছু ছাড়ে না। দিনকাল ভালো নয়। দিনে দূপুরেই চুরি ডাকাতি হচ্ছে, ছিনতাই হচ্ছে। আর বিলিতি মাল-কড়ির গন্ধ পেলে তো কথাই নেই। একেবারে নিঃস্ব করেই ছাড়বে। মহিলা বলে যে বিপদের আশঙ্কা থাকবে না, তার কোনো গ্যারান্টি আছে! আজকাল মহিলাদেরকেও বিশ্বাস করা যায় না। ওরা ছলাকলাতে খুব এ্যাক্সপার্ট। ছুরি বন্দুক ছাড়াই বাঘা বাঘা পুরুষ মানুষদের ধূর্ত চোখের বাণ মেরে পলকেই বশ করে ফেলছে, আমি তো সাধারণ একজন প্রৌঢ়া মহিলা। বিপদ অবশ্যম্ভাবী। কখন কোন ফাঁদে ফেলে দেবে, বলা যায় না।

কিন্তু না, পরক্ষণেই দেখা গেল চিনতে আমিই ভুল করেছি। মহিলাটি ট্রেন থেকে নেমে হাতের কনুই দিয়ে একটা গুঁতো মেরে বলে,-'বাব্বা, বিদেশে গিয়ে সব একেবারে ভুলে গিয়েছিস দেখছি! এখনো চিনতে পারলি না! নির্মলাকে মনে পড়ে! তোরা নিম্মু বলে ডাকতি, মনে পড়ছে!'

নামটা শুনেই আঁতকে উঠি, এ্যাঁ নিম্মু! নামটা খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে! ওতো আমাদের সাথে পড়তো! আমরা একই বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসতাম। প্রত্যেকদিন ক্লাসে লেটে এ্যাটেন্ড্ করতো আর প্রিন্সিপাল জে.ডির বকুনি খেতো। কিন্তু লেখাপড়ায় খুব ব্রিলিয়ান্ট ছিল, সিন্সিয়ার ছিল। প্রতিটি বিষয়ে সর্বোচ্চ মার্ক্স পেতো। সেই সুবাদে প্রশংসাও কুড়োতো, সেই নির্মলা?
হ্যাঁ, এইবার মনে পড়ছে! ওকে কি কখনো ভোলা যায়! খুউব মিশুকে ছিল। কথায় কথায় হাসাতো, রঙ্গ তামাশা করতো। সেই হাসির প্রলেপ যেন এখনো লেগে আছে ওর ঠোঁটের কোণে। কিন্তু ও' এখানে, এই বেশে? আর এতবড় কোলকাতা শহরে ও' করছে কি?

আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই বিস্ময়ে। চোখের তারা দু'টি ক্রমশ আমার স্থির হয়ে আসে। রুদ্ধ হয়ে যায় কণ্ঠস্বর। অভিভূতের মতো আমি হাঁ করে চেয়ে থাকি। দীর্ঘ বাইশ বছর পর নির্মলার রুক্ষ চেহারা আর বেশভূষার অভাবনীয় পরিবর্তন নজরে পড়তেই চোখদু'টো আমার অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। পারিনি সম্বরণ করতে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে। আবেগের বশীভূত হয়ে দুইহাত প্রসারিত করতেই শুস্ক মরুভূমির বুকে একপশলা বৃষ্টি ঝড়ার মতো ওর চোখেমুখ থেকে ঝোরে পড়ে একরাশ আবেগ, উচ্ছাস। অব্যক্ত আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তৎক্ষণাৎ আমার গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সহাস্যে আমার আপাদমস্তক নজর বুলিয়ে বলল,-'দ্যাখ্ তো, কেমন চিনে ফেললাম তোকে! একই রকম আছিস! একটুও বদলাস নি!'

-'আর তোকে তো চেনার উপায় নেই! এতক্ষণ কত কি ভাবছিলাম বলতো! এখনো বিশ্বাসই করতে পাচ্ছি না!' আমি বললাম।

হাসিটা মুহূর্তে মিলিয়ে গেল নির্মলার। ঠোঁটদুটো চিবিয়ে অস্ফূট হেসে ফেলল। বিষন্ন হয়ে বলল,-'চেনা অচেনায় আজ আর কিচ্ছু এসে যায় না রে! আমি কবে মরে গিয়েছি! শুধু প্রাণটাই সঙ্গে নিয়ে বয়ে বেড়াচ্ছি!'

-'কিন্তু তুই এখানে! আমি তো ভাবতেই পাচ্ছিনা! ভীষণ অবাক লাগছে! ব্যাপার কি বলতো!'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে নির্মলা বলল,-'নিজের মর্জিতে কি আর এসেছি রে! এসেছি আমার কপাল দোষে! এই পৃথিবীটা বড় বিচিত্র! তেমনি মানুষের জীবনও! আরে ছাড় তো, আমার মতো অভাগিনীর কাহিনী শুনলে বেড়ানোর আনন্দটাই তোর মাটি হয়ে যাবে! বরং তুই শোনা! এই যাঃ, আসল কথাটাই তো বলতে ভুলে গিয়েছি! আগে শীগগির একশো ডলার বের কর দেখি!'

ভাবলাম নির্মলা ঠাট্টা করছে। দেখলাম, কাঁধের ঝুলন্ত ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে কি যেন খুঁজজে। পরক্ষণেই মোটা একটা রসিদের বান্ডিল বের করে বলে,-'ওমা, হাঁ করে দেখছিস কি, আমাদের মানবসেবা কেন্দ্রের জন্য কিছু ডোনেট কর!'

স্ববিস্ময়ে বললাম,-'মানবসেবা কেন্দ্র মানে! বলিস কি রে! মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না আমার! ঘর-সংসার ছেড়ে তুই কি সমাজসেবায় বেরিয়েছিস বুঝি!'

অস্ফূট ম্লান হাসলো নির্মলা। বলল,-'ঘর-সংসার করবো, সেই সৌভাগ্য আমার কোথায় বল! জন্মলগ্নেই যে নিজের মাকে হারায়, তার কপাল তো সেদিনই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে! স্বামীর ভালোবাসা পাওয়া, স্বামী সোহাগী হওয়া, সুখে-আনন্দে জীবনযাপন করা, ওসব আমার জন্য নয় রে! আশা করাই বৃথা! মানবসেবা কেন্দ্র মানে, ওটা একটা অনাথ আশ্রম!'

শুনে থ্ হয়ে গেলাম। হতভম্বের মতো হাঁ করে থাকি। বলে কি নির্মলা! কি ধুমধাম করে, নহবৎ সাজিয়ে ওর বিবাহ হয়েছিল। শুনেছিলাম, কোলকাতা শহরের এক আভিজাত্যসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবাবের কূলবধূ ও'! বিরাট ধনী ব্যবসায়ী ওর স্বামী। অগাধ বিষয়-সম্পত্তির মালিক। শ্বেত পাথরে মোজাইক করা বিশাল আলিশান বাড়ি, এ্যাম্বাডর গাড়ি, নকর-চাকর, প্রচুর অর্থ-বিত্ত-ঐশ্বর্য্য। আর তার এই পরিণতি? তবে কি স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে এসেছে নির্মলা?

ক্ষণিকের নিরবতায় নির্মলা বলল,-'কি রে, তোর বোলতি বন্ধ হয়ে গেল কেন? বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই না!'

হ্যাঁ, সত্যিই তাই! স্বাভাবিক কারণে কিছুতেই আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। নিজের অজান্তেই মনের ভিতর থেকে একটা কৌতূহল বুদ বুদ করে উতরে উঠল। বললাম,-'অনধিকার চর্চা হলেও না বলে থাকতে পারলাম না, তুই তো অবস্থাপন্ন বাপের একমাত্র কন্যা এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুত্রবধূ! তোর এই বেশ কেন? কপালে সিঁদুর নেই, সাজ-সজ্জার বালাই নেই, হাতে কানে গহনা নেই, কেশ-বিন্যাশ এলামেলো! চেহারাটাও ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে, রুগ্ন দেখাচ্ছে। ব্যাপারটা কি বল তো!'

ফোঁস করে লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলল নির্মলা। সুদূর গগনে উড়ে যাওয়া একঝাঁক মুক্ত-বিহঙ্গের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, -'আসলে কি জানিস? মনে কিছু করিস না, এ সংসারে কেউ কারো নয়! সবাই মতলবী, ধান্দাবাজ, বুঝলি! এই দ্যাখ্ না, তোর কাছ থেকে মোটা টাকা পাবো বলেই তো তোকে জবরদস্তী ধরে নিয়ে এলাম! ভয় পাচ্ছিস? আরে না না! অপ্রত্যাশিত তোকে হঠাৎ পেয়ে গেলাম, তাই! হয়তো কোনদিন আর দেখা হবে না। তাই বলতেও আজ দ্বিধা নেই। চেয়েছিলাম শুধু মনের মতো একটা মানুষ। যাকে আমি দেবতার আসনে বসাতাম। যার হৃদয় নিংড়ানো উজার করা ভালোবাসায় আমি ধন্য হয়ে যেতাম। নারীত্বের পরিপূর্ণতায় সার্থক হতো আমার জনম! হুঁম, এটুকু সৌভাগ্যই যার কপালে ধরলো না, এই প্রাণহীণ ছলনাময় সংসারে ডানাকাটা পরীর মতো বেঁচে থেকে তার কি হবে বল! বরং আশ্রমের নিস্পাপ ছেলেমেয়েদের নিয়ে একরকম ভালোই আছি! কয়েকজনকে তো 'মা' বলেও ডাকতে শিখিয়েছি। ওরা জানে, আমিই ওদের মা!'

-'কিন্তু ওরা যখন পিতৃ পরিচয় জানতে চাইবে, তখন কি জবাব দিবি!'

-'তখন ওরা কি আর ওরা বাচ্চা থাকবে রে! ওরা বড় হবে, ওদের জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ ঘটবে, পৃথিবীকে বুঝতে শিখবে, জানতে শিখবে, জীবনের মূল্যায়ন করতে শিখবে। বর্তমান যুগে যে দূষীত সমাজে ওরা গড়ে উঠছে, যেখানে প্রতিনিয়ত লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ, নির্যাতন, দুর্নীতি, অত্যাচার, অনাচার আর ভ্রষ্ঠাচারীর সংখ্যা যে হারে বাড়ছে, এখান থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের চলমান পরিস্থিতির পারিপার্শ্বিকতার সাথে ওরা কি নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে বলে মনে করিস? কক্ষনো না! আর তার জন্য আমরা দায়ী থাকবো না! আমাদের জবাবদীহিও করতে হবেনা! ওরা যথা সময়ে নিজের পরিচয় নিজেরাই পেয়ে যাবে! ভেবে দ্যাখ্ একবার, আমরা আশ্রয় না দিলে, ওদের লালন-পালন, ভরন-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ না করলে আজ ওরা কোথায় ভেসে যেতো বলতো! আর যাই হোক, আজ ওদের নিরাপদ আশ্রয় আছে, নির্দিষ্ট ঠিকানা আছে, দু'বেলা আহার ভোজনের সুবন্দোবস্ত আছে! এমনকী প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থাও করা হয়েছে! ওরা বড় হয়ে কে কি প্রশ্ন করবে, কি কৈফেয়ৎ চাইবে, ওনিয়ে আমাদের ভাববার কিছু নেই! তবে কি জানিস, ঐ অবোধ শিশুদের মুখে 'মা' শব্দ উচ্চারণে এক অভিনব অনুভূতির জাগরণে মুহূর্তে আমার হৃদয়-মন-প্রাণ মাতৃত্বে ভরে ওঠে। নিমেষেই মানসিক শূন্যতা ও অভাববোধটা দূরীভূত হয়ে যায়। আর তক্ষুনি বুকে জড়িয়ে ধরে ওদের কপালে গালে চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দেই একরাশ আদর স্নেহ ভালোবাসা। পেটে না ধরলেও গহীন অনুভূতি দিয়ে অনুভব করি আর ভাবি, পৃথিবীর সমগ্র নারীজাতির চিরন্তন কাঙ্খিত স্বপ্ন এবং আশা, মা হওয়া। আর মা হওয়াই নারীত্বের পূর্ণতা, জীবনের সার্থকতা। যা কারো কারো জীবনে স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। কখনো মা হতে পারে না। আর কেউ

পেয়ে হারায়। কিন্তু যতই করি, একজন গর্ভধারিনী মায়ের শূন্যস্থান কেউ কোনদিন পূরণ করতে পারে না! পারবেও কোনদিন। তার প্রমাণসরূপ স্বয়ং আমি নিজেই! যদিও ভোগ-বিলাসিতা আর আরাম-আয়েশে গড়ে উঠেছি, অভাব-অনটন, দুঃখ-দৈনতা কি জিনিস, তা কখনো অনুভব করি নি! কিন্তু আমিও তো ওদের মতোই একজন, সে কথা আজ অস্বীকার করি কেমন করে বল্! তাই প্রতিনিয়ত আদর-স্নেহ-মমতা-ভালোবাসার ছত্রছায়ার ওদের আলগে রাখি, যতটুকু পারি ওদের আনন্দ দেবার চেষ্টা করি, খুশী করার চেষ্টা করি। অন্তত ওরাও মানুষকে ভালোবাসতে শিখুক! মানুষকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে শিখুক। মানুষের মর্যাদা বুঝতে শিখুক! ওদের ভালোবাসা কি ভালোবাসা নয়! ক'দিনই বা আর বাঁচবো বল! জীবনের অর্ধেকটা তো প্রায় কাটিয়েই দিলাম। নুতন করে পাবার আর কিছু নেই! আশাও করিনা! তাতে শুধু দুঃখই বাড়ে!'

বলতে বলতে গলা ভারি হয়ে আসে নির্মলার। মুক্তোর মতো বিন্দু বিন্দু অশ্রুকণায় চোখদু'টো ওর চিক্‌চিক করে ওঠে।

যুথিকা বড়ুয়া : টরোন্টো প্রবাসী গল্পকার ও সঙ্গীত শিল্পী।

jbarua1126@gmail.com